ISSN 2072-3334
Development Compilation
Volume 10. Number 02. March 2014

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসনের পটভূমি এবং প্রত্যাবর্তন : রাজনৈতিক উন্নয়ন-বিষয়ক পর্যালোচনা

ড. মো. সুলতান মাহমুদ*

Abstract : In 1990 Bangladesh entered into the process of democratic transition in the wake of huge mass upsurges and although there have been regular elections and transfer of powers, the country is yet to achieve democratic consolidation. Thus the issue of democratic consolidation in Bangladesh is of crucial importance for the global agenda of democratization. Democracy in Bangladesh is at the crossroads. The political parties have largely failed here. There are many alarming signs of erosion of democracy in the country. The Parliament is largely ineffective. The civil service has become increasingly partisan, ineffective and corrupt. Successive governments have failed to achieve separation of judiciary from the executive. However, the focus of this paper is on the nature and problems of democratization in Bangladesh. The paper is to examine the problems of democratization which is on understanding the problems of political development in Bangladesh.

পটভূমি

ব্রিটিশ ঔপনিবেশ-পরবর্তী জাতীয়তাবাদী ভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরেই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম। ভাষা আন্দোলন-পরবর্তী প্রায় দু'দশক ধরে সাধারণ জনগণের আন্দোলন সংগ্রামের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে।[১] তবে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সৃষ্টির নিশ্চয়তার বিষয়টি সহজ ছিল না। ব্রিটিশ ঔপনিবেশ শাসনে ১৯৪৭ সালে যখন দ্বি-জাতিতত্ত্বের[২] ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হলে হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে ভারত এবং মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। বাঙালিরা মুসলমান হিসেবে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের মাতৃভাষার ওপর আঘাত হানে। পাকিস্তানিদের উর্দূ ভাষা বাঙালিদের চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে তাৎক্ষণিকভাবে নিজেদের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে বাঙালিরা। বাঙালিদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অসাধারণ বিজয়ের মাধ্যমে বৈধতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় এবং পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বাঙালিদের ওপর অতর্কিত হামলায় গণহত্যা শুরু হলে তাৎক্ষণিক ওই রাতেই অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ১২.২০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান[৩] স্বাধীনতার ঘোষণা[৪] প্রদান করেন। পরবর্তীতে মেজর জিয়া ২৭ মার্চ

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। E-mail: smahmud@ru.ac.bd

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।[৫] কিন্তু চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জিত হয় নয় মাস সশস্ত্র সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা[৬] দাবিকে সামনে রেখে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন পরবর্তী কয়েক দশকে যথাযথ স্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি।

সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম সারাবিশ্বে জনপ্রিয়তার সাথে সমাদৃত হয়। পাকিস্তানি শাসন-শোষণ থেকে নিজেদের মুক্ত করে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার পরিচয় থেকে পৃথক হয়ে একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় বাঙালিদের মর্যাদার আসনে সমাসীন করে জনপ্রিয়তার সাথে সারা বিশ্বে এবং দেশের অভ্যন্তরেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনৈতিক উন্নয়ন সাধনের স্বপ্ন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছাতে শুরু করে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খুব দ্রুত স্বীকৃতি এবং জনপ্রিয়তা লাভ করলেও স্বাধীনতার চার দশক পরেও বাংলাদেশে রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে বারবার। বিশেষ করে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা, জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা এবং সিভিল সমাজের কার্যকর ভূমিকা না থাকায় বাংলাদেশ রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি। এমনকি উন্নয়নের পথ এখন পর্যন্ত কণ্টকমুক্ত নয় এবং এক্ষেত্রে বিদ্যমান রয়েছে নানাবিধ সংকট ও প্রতিবন্ধকতা ।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ শুরু থেকে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে শুরু করে এবং সংবিধান মোতাবেক সেভাবেই যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এই চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি নিয়ে সংবিধান কার্যকর হয়। একটি সংসদীয় ধরনের সরকারব্যবস্থা, বহুদলীয় ব্যবস্থা সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন, মৌলিক মানবাধিকার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রত্যয় ছিল এই সংবিধানে।[৭] কিন্তু স্বাধীনতার চার বছরের মধ্যেই গণতান্ত্রিক স্বপ্নে লালিত রাষ্ট্রটি সামরিক শাসনের কবলে (১৯৭৫-১৯৯০) পতিত হয়। সামরিক শাসকদের ঘন ঘন সংবিধানের ওপর হস্তক্ষেপ প্রাথমিকভাবে প্রতিশ্রুত সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। ১৯৭৭ সালে এক সামরিক আইন জারির মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে বাতিল করে সংবিধানে 'আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' এবং সমাজতন্ত্রকে স্থাপন করা হয় অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ন্যায়বিচার অর্থে।[৮] ১৯৮৮ সালে ইসলামকে সাংবিধানিকভাবে[৯] রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[১০] স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশ শরণার্থীদের পুনর্বাসন করে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয় এবং অর্থনৈতিক অবস্থা ওঠা-নামা করতে শুরু করে।[১১] ১৯৭৪ সালে অর্থনৈতিক সূচকের মাত্রা অধিক কমে যাওয়ায় দেশে এক চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তা সত্ত্বেও গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক উন্নয়নের অঙ্গীকার থেকে রাষ্ট্র বিন্দুমাত্র সরে আসেনি।

বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচন এবং দুর্ভিক্ষসহ ১৯৮৭-৮৮, ১৯৯৮ সালের বন্যা সফলতার সাথে মোকাবিলা করে।[১২] জনউদ্যোগ এবং এনজিও সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দারিদ্র্য মোকাবিলায় সহযোগিতা করে। এছাড়াও বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে সিভিল সমাজের ভূমিকা তৃণমূল থেকে শুরু করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসা পায়। বিশ্বে সর্বোচ্চ দশটি জনপ্রিয় স্বাধীনতার ইতিহাসের মধ্যে বাংলাদেশের ইতিহাস সর্বোচ্চ হওয়া সত্ত্বেও উত্তর ও দক্ষিণ বিশ্বে বাংলাদেশ পরিচিত ছিল না। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ মন্তব্য করেন যে,

বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত নয়।[১৩] আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুভিক্ষ, বন্যা, সাইক্লোন প্রভৃতির সংবাদ গুরুত্বসহকারে প্রচার করেছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহ বাংলাদেশের এ ধরনের সমস্যা সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতির প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত কিছু প্রতিবেদনও পেশ করে। প্রতিবেদনে উপস্থাপিত নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত সুপারিশের মাধ্যমে শক্তভাবেই রাজনৈতিক উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার প্রয়াস চালানো হয়।

১৯৯০ সালে ব্যাপক গণআন্দোলনের মাধ্যমে সামরিক সরকারকে উৎখাত করতে সক্ষম হয় এদেশের জনগণ। নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদে উগ্র ইসলামী শক্তির প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি হয়।[১৪]

আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসনের প্রত্যাবর্তনে ও রাজনৈতিক পরিবর্তনে এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। নিম্নে এক নজরে স্বাধীনতা-পরবর্তী রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সরকারব্যবস্থার কাঠামোকে সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

সারণি ১: রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সরকারব্যবস্থা : ১৯৭২-২০০১

সংসদ	নির্বাচিত (বছর)	রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকারপ্রধান	মেয়াদকাল (মাস)
১৯৭২-১৯৭৪ : সংসদীয় গণতন্ত্র অস্থায়ী সংবিধান আদেশ ১৯৭২ বাংলাদেশ সংবিধান ১৯৭২			
প্রথম	১৯৭৩	আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবুর রহমান, প্রধানমন্ত্রী	৩০
জানুয়ারি ১৯৭৫ : রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার, সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী শেখ মুজিবুর রহমান, রাষ্ট্রপতি			
দ্বিতীয়	১৯৭৯	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) জিয়াউর রহমান, রাষ্ট্রপতি	২৭
১৯৮১-১৯৮২ : বেসামরিক শাসন (রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার) বিচারপতি আব্দুস সাত্তার, ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি			
১৯৮২-১৯৯০ : সামরিক শাসন (রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার) সেনাপ্রধান লে. জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ, রাষ্ট্রপতি			
তৃতীয়	১৯৮৬	জাতীয় পার্টি, হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ, রাষ্ট্রপতি	১৭
চতুর্থ	১৯৮৮	জাতীয় পার্টি, হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ, রাষ্ট্রপতি	৩১
পঞ্চম	১৯৯১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) খালেদা জিয়া, প্রধানমন্ত্রী	৫৬
ষষ্ঠ	১৯৯৬	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) খালেদা জিয়া, প্রধানমন্ত্রী	১১ দিন
সপ্তম	১৯৯৬	আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রী	৬০

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসনের প্রত্যাবর্তন এবং যাত্রা (১৯৯১-২০০১)

নব্বই এর গণআন্দোলনের ফসল হিসেবে গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক শাসনের বিজয় হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলোচনা, সমঝোতা এবং সংলাপের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে মৌলিক কিছু রূপরেখা প্রণীত হয়। একটি বিষয়ে ঐকমত্য হয় যে, রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক শাসনের ধারা অব্যাহত রাখবে। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ এর অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হয়। সরকারের নিরপেক্ষতাই এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার অন্যতম হাতিয়ার ছিল। ৯০ দিনের মধ্যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অবাধ নির্বাচন উপহার দেয় যা আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের পর্যবেক্ষকগোষ্ঠী কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশে ইতোপূর্বে এমন নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি বলে বিশ্লেষকরা মতামত প্রকাশ করলেও ৮ দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে সূক্ষ্ম কারচুপির অভিযোগ এনে বলেন, নির্বাচনের ফলকে প্রভাবিত করতে অশুভ শক্তি সফল হয়েছে এবং নির্বাচনের প্রত্যাশিত ফলকে উল্টে দেয়া হয়েছে।[১৫] বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি ১৪০টি আসন লাভ করে, আওয়ামী লীগ ৮৮টি, জাতীয় পার্টি ৩৫টি এবং জামায়াতে ইসলামী ১৮টি আসন লাভ করে। জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন নিয়ে বিএনপি ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার গঠন করে।[১৬]

বিএনপি সরকার (১৯৯১-১৯৯৬)

১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ উভয় দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংসদে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে একটি সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পুনঃস্থাপিত হয় এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর থেকে সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলে রাজনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা জাগ্রত হয়। গণতান্ত্রিক শাসনের মাধ্যমে দেশে রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠা ছিল বেগম খালেদা জিয়ার প্রধান চ্যালেঞ্জ।[১৭] প্রাথমিকভাবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির গঠনমূলক মতামতের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসনের যাত্রা শুরু হলেও দুই বছরের মধ্যেই তা সংকটমুখী হতে শুরু করে। অন্যতম রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে সামনে আসে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন। দুই দলের মধ্যে প্রায়ই সংঘাত এবং সহিংসতা সৃষ্টি হয় কতিপয় পৌরসভা ও সংসদ উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে। চূড়ান্তভাবে ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত মাগুরা উপনির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি ও ভোট চুরির অভিযোগ এনে সম্পূর্ণভাবে নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করে সরকারের পদত্যাগ দাবি করে এবং একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রশ্ন তোলেন আওয়ামী লীগ। পরবর্তী দুই বছর সংসদ বর্জনসহ আওয়ামী লীগ রাজপথে আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন এবং সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোরও সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়। জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টিকে নিয়ে আওয়ামী লীগ হরতাল, ধর্মঘটে দেশ অচল করে দেয়। অতঃপর ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আওয়ামী লীগ সংসদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়।

সিভিল সমাজ এবং আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠীগুলো সরকারি দল ও বিরোধীদলকে রাষ্ট্রের অচলাবস্থা নিরসনের আহ্বান জানান। সিভিল সমাজ সংগঠন যারা ১৯৯০ সালের পূর্বে সামরিক শাসন অবসানের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল তারাও রাস্তায় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এমনকি তারা বিএনপি ও আওয়ামী লীগকে আলোচনা, সংলাপ ও সংবিধানের ভিত্তিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান

জানান। আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠী যারা সামরিক সরকার-বিরোধী অবস্থানে ছিল তারাও বিএনপি-আওয়ামী লীগের মধ্যে মধ্যস্থতা করার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। কমনওয়েলথ সচিব, ঢাকায় অবস্থিত রাষ্ট্রদূতগণ বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে ব্যর্থ হন।[১৮]

বিরোধীদলগুলো দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সংসদ বর্জন অব্যাহত রাখে এবং ঘন ঘন হরতাল, ঘেরাও, বিক্ষোভ, রেলপথ-রাজপথ অবরোধ, ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে। ফলে দেশে এক সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু সরকারের উপর চাপ প্রয়োগের লক্ষ্যে বিরোধীদলগুলো আলটিমেটাম দেয় যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি পূরণ না হলে বিরোধী সদস্যগণ ১৯৯৪ সালের ৮ ডিসেম্বর পদত্যাগ করবেন। বেগম খালেদা জিয়া এমন হুশিয়ারিকেও গুরুত্ব দেননি। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত দিনেই (২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৪) ১৪৭ জন বিরোধীদলীয় সংসদ-সদস্য পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। কিন্তু ক্ষমতাসীনরা পদত্যাগপত্রগুলো গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ, পদত্যাগপত্রগুলো গ্রহণ করলে ১৪৭টি আসনে উপনির্বাচন করতে হবে। বিরোধীদলগুলোর প্রতিরোধের মুখে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নাও হতে পারে। আর বিরোধীদলবিহীন নির্বাচন সম্ভব হলেও তা সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৯৯৫ সালের ১৯ জুন বিরোধীদলীয় সদস্যদের সংসদে অনুপস্থিতির ৯০ দিন পূর্ণ হয়। সংবিধানে বিধান রয়েছে যে, কোনো সদস্য সংসদের অনুমতি ব্যতীত যদি একাদিক্রমে ৯০ বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে তাঁর আসন শূন্য হবে (অনুচ্ছেদ ৬৭(১)(খ))। যেহেতু সংসদের অনুমতি না নিয়ে বিরোধীদলীয় সদস্যগণ ৯০ বৈঠক দিবস অনুপস্থিত ছিলেন, সেহেতু ২ জুন ১৯৯৪ হতে তাঁদের আসন আপনা-আপনি শূন্য হয়ে যায়। অথচ সরকার কালক্ষেপণের উদ্দেশ্যে সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের অভিমত চেয়ে পাঠায়। সুপ্রিম কোর্ট দ্রুততার সঙ্গে শুনানী শেষে অভিমত প্রদান করে যে, ৯০ বৈঠক দিবস অনুপস্থিত সদস্যদের আসন শূন্য হয়ে গেছে।

সংবিধানের ১২৩ (৪) অনুচ্ছেদের বিধান রয়েছে যে, কোনো কারণে সংসদের কোনো সদস্যপদ শূন্য হলে পদটি শূন্য হবার ৯০ দিনের মধ্যে উক্ত শূন্য পদ পূর্ণ করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতে, যদি কোনো দৈব দুর্বিপাকের কারণে উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয়, তা হলে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দৈব দুর্বিপাকের কোনো ঘটনা না ঘটা সত্ত্বেও প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ কে এম সাদেক উপর্যুক্ত বিধান বলে উপনির্বাচনের তারিখ ৯০ দিন (১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত) পিছিয়ে দেন।

বিরোধীদল সরকারের উপর্যুক্ত পদক্ষেপগুলোকে কালক্ষেপণের মাধ্যমে ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করার প্রচেষ্টা বলে মনে করে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের আন্দোলন তীব্রতর হয়। অপরদিকে, নির্বাচন কমিশন উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। ২ নভেম্বর ছিল মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ। কিন্তু বিরোধীদলগুলো উপনির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তারা কোনো মনোনয়ন পত্র দাখিল করেনি। এমতাবস্থায় ১৯৯৫ সালের ২ নভেম্বর রাতে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদ ভেঙে দেন। নির্বাচন কমিশন নূতন সংসদ নির্বাচনের তারিখ প্রথমে ১৮ জানুয়ারি ১৯৯৬ ধার্য করে, এবং পরে ভোট গ্রহণের তারিখ পরিবর্তন করে ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করা হয়।

চলমান রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সংকট থাকা সত্ত্বেও ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন ধার্য হলে রাজনৈতিক সমস্যা আরো ঘনীভূত হয়। পরবর্তীতে সিভিল সমাজ সংগঠন, এমনকি বেসামরিক আমলাবাহিনী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে মাঠে নেমে আসে। খালেদা জিয়ার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি না মেনে আর কোনো উপায় ছিল না। নির্বাচিত ষষ্ঠ সংসদ শুধু একটি অধিবেশনে সংসদ নির্বাচনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাশ করে।[১৯]

খালেদা জিয়া আবার সংসদ ভেঙে দিয়ে সাবেক প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনা দুজনই সংঘাতমুখী অবস্থা থেকে বের হয়ে এসে নির্বাচনমুখী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। শেখ হাসিনা দাবি করেন যে, খালেদা জিয়াকে শক্তি প্রয়োগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি দেশে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করেছেন। অন্যদিকে খালেদা জিয়াও দাবি করেন যে, তিনি একটি সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ফর্মুলা দিয়ে গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছেন। পরবর্তীতে ৯০ দিনের মধ্যে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতন্ত্রের যাত্রা সমুন্নত হয়। আবারো সকল জাতীয়, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকগ্রুপ কর্তৃক ১৯৯৬ সালের সপ্তম সংসদ নির্বাচন গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ হিসেবে স্বীকৃত হয়। ১৯৯৬ সালের জুনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৪৬ আসন, বিএনপি ১১৬টি এবং জাতীয় পার্টি ৩২টি এবং জামায়াতে ইসলামী ৩টি আসন লাভ করে। বিভিন্ন নির্বাচন পর্যবেক্ষকদল ও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী কর্তৃক স্বীকৃত নির্বাচন হওয়া সত্ত্বেও বিএনপি ভোট কারচুপির অভিযোগ তোলে।

আওয়ামী লীগ সরকার (১৯৯৬-২০০১)

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ প্রভাবশালীগোষ্ঠীগুলোর (সিভিল সমাজ, আমলাবাহিনী, সামরিক বাহিনী এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়) সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। কতিপয় অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা, বেসামরিক আমলা এবং ব্যবসায়ীরা ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাদের অনেকেই দীর্ঘদিন থেকে আওয়ামী লীগের সমর্থক হিসেবে কাজ করেছে।

শেখ হাসিনা জাতীয় ঐকমত্যের সরকার, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতির মাধ্যমেই শাসন পরিচালনার উদ্যোগ নেন। জাতীয় ঐকমত্যের সরকারে প্রধান বিরোধীদল বিএনপিকেও অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। বিএনপি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও অন্য দু'টি দল জাতীয় পার্টি ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ঐকমত্যের সরকারে যোগদান করে। সরকার শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য এবং সিভিল প্রশাসনে উন্নয়নের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কতিপয় কমিশন গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।[২০] নতুন শিল্প ও স্বাস্থ্য নীতি অনুমোদিত হয়। চারস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকারের কাঠামো প্রস্তাব করা হয় এবং ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বেসামরিক আমলারা সরকার পরিচালনায় সহযোগিতা করেন। বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচার-প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিধান ইনডেমনিটি বিল বাতিল করে হত্যাকারীদের বিচারের মুখোমুখি করা হয়। (ইনডেমনিটি বিল সম্পর্কে পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) ভারতের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে এবং দীর্ঘ বিরোধের মাথায় এসে দু'টি উলেখযোগ্য অর্জন হিসেবে ১৯৯৬ সালে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গা-পানি বন্টন চুক্তি এবং ১৯৯৭ সালে পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[২১] শান্তি চুক্তির প্রস্তাবনায় বলা হয় যে,

সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সর্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি অবিচল আস্থা রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হতে জনসংহতি সমিতি এই চুক্তিতে উপনীত হলেন।

১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর গঙ্গার পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে ৩০ বছর মেয়াদী এই চুক্তি দু'দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা হয়। দীর্ঘ দিনের বিরোধপূর্ণ একটি ইস্যুতে চুক্তিহীন অবস্থা থেকে চুক্তি সম্পাদন করার ফলে দু'দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুনরায় পারস্পরিক আস্থা ও সৌহার্দ্য ফিরে আসে। চুক্তি সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ শুষ্ক মৌসুমে কমপক্ষে ৩৫ হাজার কিউসেক পানি পাবার নিশ্চয়তা পেয়েছে।[২২] বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরোধী শিবিরে চুক্তিটি সমালোচনার শিকার হয়। তৎকালীন প্রধান বিরোধীদল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে এই চুক্তির দ্বারা জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেবার অভিযোগ করে বলেন, সামগ্রিকভাবে এই চুক্তির দ্বারা বাংলাদেশ ভারতের প্রতারণার শিকার হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি মনে করে এই চুক্তি গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করেছে।[২৩] এই চুক্তিকে তারা বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী বলে অভিহিত করে।[২৪] তবে বাংলাদেশের গণমাধ্যম এই চুক্তিকে সমর্থন করে বিভিন্ন প্রতিবেদন/সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।

অন্যদিকে পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে দেশ ও বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, শান্তি চুক্তিটি দেশ ও জাতির জন্য অপরিহার্য ছিল। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে আসবে, সেখানে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড জোরদার হবে, সেখানকার বাঙালি পাহাড়ি মিলে দেশ গঠন ও উন্নয়নে কাজ করবে। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ ছাড়াও অনেক প্রগতিশীল সংগঠন- বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি, গণফোরাম, জাসদ, বাসদ প্রভৃতি দল পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, জাপান, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশের সরকার বা মিশন প্রধানও এই চুক্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এই সাফল্যের জন্য সরকারের প্রশংসা করেন। কিন্তু প্রধান বিরোধীদল বিএনপি, জাতীয় পার্টির একটি উপদল ও জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে 'কালো চুক্তি' আখ্যায়িত করে তীব্র বিরোধিতা করে।[২৫]

গণতান্ত্রিক যাত্রায় অঙ্গীকারবদ্ধ হলেও আওয়ামী লীগ সরকারকে কিছু চলমান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। সরকারের প্রতি অনাস্থার অংশ হিসেবে বিএনপি সংসদ অধিবেশন বর্জন করে রাজপথে আন্দোলন সংগ্রামে লিপ্ত হয়। হরতাল ও অবরোধে দেশ প্রায় অচল হয়ে যায়। বিএনপি ক্ষমতায় আসলে গঙ্গা-পানি বণ্টন চুক্তি ও শান্তি চুক্তি বাতিল করবে মর্মে আন্দোলন করতে থাকে, এছাড়াও ভারতের সাথে ট্রানজিট, ট্রানশিপমেন্ট ও পণ্য আমদানী-রপ্তানী প্রসঙ্গে আন্দোলন অব্যাহত রাখে।

বিএনপি সদস্যগণ সংসদের প্রথম বৈঠক হতেই দফায় দফায় 'ওয়াকআউট' করেন এবং তাঁদের হৈচৈ, ফাইল পিটানো, অন্যকে কথা বলতে বাধা দান, স্পিকারকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ, ইত্যাদি কারণে সংসদের কার্যক্রম ব্যাহত হয়। তদুপরি ৩০ নভেম্বর, ১৯৯৬ সালে বিএনপি দশ দফা

অভিযোগের ভিত্তিতে আকস্মিকভাবে সংসদ বর্জন শুরু করে। এসব অভিযোগের মধ্যে ছিল বিরোধীদলীয় সদস্যদের সংসদে কথা বলার সুযোগ না দেয়া, রেডিও-টেলিভিশনে তাঁদের বক্তব্য যথাযথভাবে প্রচার না করা, সংসদীয় কমিটিগুলোতে তাঁদের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব না দেয়া এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সংসদে আলোচনার সুযোগ না দেয়া।

বিএনপিকে সংসদে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের উচ্চ পর্যায় হতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সকল বিষয় মীমাংসার আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু বিএনপি আলোচনার পূর্বশর্ত হিসেবে দলীয় নেতা-কর্মীদের কারামুক্তি এবং তাঁদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানায়। ১৯৯৭ সালের ১৪ জানুয়ারি সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত এক সমঝোতার পর বিএনপি সংসদ অধিবেশনে যোগদান করে।

কিন্তু ১৯৯৭ সালের ৩০ আগস্ট ষষ্ঠ অধিবেশনের প্রথম দিনে বিএনপি সদস্যগণ আবার সংসদ বর্জন শুরু করেন। তাঁরা অষ্টম অধিবেশনের প্রথম দিকে সংসদে যোগদান করলেও শেষের দিকে আবার সংসদ হতে বের হয়ে আসেন। বিএনপির অভিযোগ ছিল যে, সরকারপক্ষ সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। অষ্টম ও নবম অধিবেশনে টানা ১৬ কার্যদিবস অনুপস্থিত থাকার পর ১৯৯৮ সালের ২৫ জুন (নবম অধিবেশনের শেষের দিকে) বিরোধীদলীয় সদস্যরা সংসদে আবার ফিরে আসেন। কিন্তু সপ্তম সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশন হতে বিরোধীদল স্থায়ীভাবে সংসদ বর্জন শুরু করে। ১৯৯৯ সালের ৮ জুলাই হতে সপ্তম সংসদের শেষ দিন ২০০১ সালের ১৩ জুলাই পর্যন্ত মোট দুই বছর পাঁচ দিন ধরে তাঁরা সংসদ বর্জন করেন। তবে ২০০০ সালের বাজেট অধিবেশন চলাকালে ২০ জুন তারিখে সদস্যপদ রক্ষার্থে একদিন মাত্র ৪৫ মিনিটের জন্য বিরোধীদলীয় সদস্যগণ সংসদে যোগদান করেন। সংবিধানের ৬৭ (১) (খ) অনুচ্ছেদে বিধান রয়েছে যে, কোনো সংসদ-সদস্য সংসদের অনুমতি না নিয়ে একাদিক্রমে ৯০ বৈঠক দিবস সংসদে অনুপস্থিত থাকলে তাঁর সংসদ-সদস্যপদ বাতিল হবে।

সপ্তম সংসদের মেয়াদকালে মোট ২৩টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ ২৩টি অধিবেশনের মধ্যে বিরোধীদল ১১টিতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। তবে বিরোধীদলীয় সদস্যগণ সংসদীয় কমিটিগুলোতে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁরা সংসদে অনুপস্থিতি কালের বেতন-ভাতাসহ প্রাপ্য সকল সুবিধা গ্রহণ করেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিএনপি ১২ জুন অনুষ্ঠিত সপ্তম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেয়নি। বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া সংসদকে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু না করে রাজপথে আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে হরতালকে বেছে নেন। সরকার পতনের আন্দোলনকে সফল করার লক্ষ্যে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি (এরশাদ) ও ইসলামী ঐক্যজোটের সঙ্গে মিলিত হয়ে ৪ দলীয় জোট গঠন করে। অবশ্য আওয়ামী লীগ শাসনের শেষ দিকে এরশাদের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টির মূল অংশ ৪ দলীয় জোট ত্যাগ করে এবং 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন' নামক এক ধর্মীয় ডানপন্থী দলের সঙ্গে 'ইসলামী জাতীয় ঐক্যজোট' নামে একটি পৃথক জোট গঠন করে। তবে নাজিউর রহমান ও ফিরোজ রশিদের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টির একটি ছোট অংশ ৪ দলীয় ঐক্যজোটে থেকে যায়।

বিএনপি ১৯৯৭ সালে একক ও জোটবদ্ধভাবে মোট ৯ দিনে ৮৭ ঘণ্টা হরতালের কর্মসূচি পালন করে। ১৯৯৭ হতে ২০০০ সাল পর্যন্ত বিরোধী জোটের হরতালের কর্মসূচি ছিল মোট ৫৮ দিনে ৭৭৮ ঘণ্টা। ২০০১ সালের প্রথম ৪ মাসে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট কর্তৃক আহূত হরতালের দিবস

সংখ্যা ছিল ১৮ এবং ঘণ্টা সংখ্যা ছিল ৩০৭।[২৬] হরতাল ও সরকার-বিরোধী অন্যান্য কার্যকলাপের ফলে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা বৃদ্ধি পায়, বিদেশী বিনিয়োগ বাধগ্রস্ত হয় এবং হরতালের দিন ভাঙচুর ও বোমাবাজিতে সম্পত্তি ও প্রাণ হানির ঘটনা ঘটতে থাকে। চারদলীয় জোট আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগকে প্রধান দাবি হিসেবে উপস্থাপন করে।

২০০১ সালের ২১ মার্চ খালেদা জিয়া পল্টন ময়দানে ৪ দলীয় জোট আহূত এক জনসমাবেশে সরকারকে আলটিমেটাম দিয়ে বলেন, ৩০ মার্চের মধ্যে পদত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হরতালের মাধ্যমে দেশ অচল করে দেয়া হবে।

বিরোধীদলের অনড় অবস্থানের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করেন। ৩০ মার্চ তারিখে ঢাকার প্যারেড গ্রাউন্ডে আওয়ামী লীগ আয়োজিত মহাসমাবেশে তিনি আগাম নির্বাচনের প্রশ্নে ৫টি শর্তারোপ করেন :

১. বিএনপিকে সংসদে আসতে হবে; ২. তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ও নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় আসতে হবে; ৩. হরতাল প্রত্যাহার করতে হবে এবং ভবিষ্যতে হরতাল করবেনা বলে বিরোধীদলকে ওয়াদা করতে হবে; ৪. নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন করবে বলে বিরোধীদলকে মুচলেকা দিতে হবে; ৫. আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।[২৭] প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিরোধীদল এসব শর্ত না মানলে আগাম নির্বাচন নয়, সংবিধান অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন হবে।

এভাবে নানাবিধ টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে আগাম নির্বাচনের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। সপ্তম সংসদের মেয়াদ ছিল ১৩ জুলাই, ২০০১ পর্যন্ত। সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদে বিধান রয়েছে যে, মেয়াদ শেষে সংসদ ভেঙে যাবার ৯০ দিনের মধ্যে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সে অনুসারে ১১ অক্টোবর ২০০১ তারিখের মধ্যে অষ্টম সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলক ছিল। ইতোপূর্বে বাংলাদেশে কোনো সংসদই পাঁচবছর মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেনি। মেয়াদ পূর্ণ হবার পূর্বেই সংসদ ভেঙে যায় এবং কোনো সরকারই স্বাভাবিক বা নিয়মতান্ত্রিক পথে বিদায় গ্রহণ করতে পারেনি।

মূল্যায়ন

বিশ্লেষণ সাপেক্ষে বলা যায়, বাংলাদেশ স্বাধীনতা-পরবর্তী চারদশক নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকার (১৯৭১-৭৫) থেকে সামরিক শাসন (১৯৭৫-১৯৯০) এবং চূড়ান্তভাবে ১৯৯১ সালে পুনরায় নির্বাচিত গণতান্ত্রিক শাসনের আবির্ভাব ঘটে। বিভিন্ন সময়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক কার্যকারিতার সম্ভাবনা সৃষ্টি হলেও রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রবণতাগুলো কার্যকর হয়নি। তবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে সিভিল সমাজ যথাযথ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু '৯০-পরবর্তী গণতান্ত্রিক শাসনে এসে দলীয় রাজনীতির প্রভাব থেকে সিভিল সমাজ মুক্ত হতে পারেনি। রাজনৈতিক উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পর্যালোচনার ভিত্তিতে এ কথা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক উন্নয়নের যাত্রা বিভিন্ন সময়ে হোঁচট খেয়েছে। দীর্ঘ সময় সামরিক শাসনের (১৯৭৫-৯০) পর গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সরকার বিভিন্ন বাস্তবতার কারণে রাজনৈতিক উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা, নির্বাহী বিভাগের দায়িত্বশীলতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা,

রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, আমলাতন্ত্র, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা, অবাধ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা, সিভিল সমাজের কার্যকর ভূমিকার ক্ষেত্রে দেশে নানাবিধ সংকটাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়। কাজেই দেখা যায় যে, বাংলাদেশ সৃষ্টির পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দেশে রাজনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশকগুলো যথাযথভাবে পূরণ হয়নি, ফলে রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ:

১ A. F. Salahuddin Anmed, *Bengali Nationalism and the Emergence of Bangladesh* (Dhaka : International Centre for Bengali Studies, 1994), p. 41.

২ জিন্নাহ তাঁর দ্বিজাতি তত্ত্ব সম্পর্কে বলেন "The differences between Hindus and Muslims is deep-rooted. We are a nation with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature ... customs and calendar, history and traditions, aptitudes and ambitions." (হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য গভীরে প্রথিত ও অমোচনীয়। আমরা পৃথক জাতি, আমাদের রয়েছে নিজস্ব স্বতন্ত্র কৃষ্টি ও সভ্যতা, ভাষা ও সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্য, নাম ও নামকরণের পরিভাষা, প্রথা ও পঞ্জিকা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, দৃষ্টিভঙ্গি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা)।

৩ পাকিস্তান বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে ২৫ মার্চ (১৯৭১) রাত ১টা ১০ মিনিটে তাঁর ধানমন্ডিস্থ বাসভবন থেকে বন্দি করে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। সেখানে মিয়ানওয়ালী কারাগারে তিনি বন্দি থাকেন। ২৬ মার্চের ভাষণে ইয়াহিয়া খান তাঁকে দেশোদ্রোহী আখ্যা দেন। ১১ আগস্ট বিচার শুরু হয়। পাঁচজন সদস্যের সামরিক আদালতে মাত্র এক ব্যক্তি ছিলেন বেসামরিক বিচারক। গুরুতর বারোটি অভিযাগের প্রধান ছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা এবং এসব অপরাধের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। এ কে ব্রোহি বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে তাঁর উকিল হন। তবে ইয়াহিয়ার ২৬ মার্চের বক্তৃতার রেকর্ড শুনবার পর বঙ্গবন্ধু আত্মপক্ষ সমর্থনে অস্বীকৃতি জানান ... ১ ডিসেম্বর মামলা শেষ হয় এবং ৪ ডিসেম্বর রায় প্রদান শুরু হয়। বেসামরিক বিচারক অনিবার্য কারণে অনুপস্থিত থেকে সিদ্ধান্ত দানে বিরত থাকেন। ... মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত এই নেতাকে মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত নেন প্রেসিডেন্ট ভুট্টো... সুদীর্ঘ নয়মাস বঙ্গবন্ধু কারাগারে একাকিত্ব সহ্য করেন। এবং দেশে বা বিদেশে এই সময়ে কী ঘটে সেই খবর সযত্নে তাঁর কাছে গোপন রাখা হয়। এমন অমানবিক নির্যাতনে মানুষটি যে তাঁর বিশ্বাস ও স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হন তা সত্যিই বিস্ময়কর।' দ্রষ্টব্য : আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ : জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব* (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০), পৃ. ২৯৫; মো. মাহবুবুর রহমান, "আওয়ামী লীগের শাসনামল, ১৯৭২-১৯৭৫"; M.A. Bari & M. Fayek Uzzaman (edi.), *History Society Culture : A. B. M. Husain Festschrift* (Dhaka : Khan Brothers & Co., 2009), p. 522.

৪ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালো রাত্রিতে পাকিস্তানের সামরিকজান্তা ঢাকাসহ সারাদেশে গণহত্যা শুরু করলে বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ১২.২০ মি. অর্থাৎ ২৬ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। ঘোষণাটি নিম্নরূপ :

"This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of Pakistan occupation army is expelled from soil of Bangladesh and final victory is achieved. Khoda Hafez, Joy Bangla." (এই হয়তো আপনাদের জন্য আমার শেষ বাণী। আজ থেকে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। যে যেখানে থাকুন, যে অবস্থায় থাকুন হাতে যার যা আছে তাই নিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। ততোদিন পর্যন্ত

লড়াই চালিয়ে যাবেন যতোদিন পর্যন্ত না দখলদার পাকিস্তানিদের শেষ সৈনিকটি বাংলাদেশের মাটি থেকে বহিষ্কৃত হচ্ছে, খোদা হাফেজ, জয় বাংলা।); দ্রষ্টব্য, আনু মাহমুদ (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু : বাংলাদেশ একটি ইতিহাস* (ঢাকা : জ্যেৎস্না পাবলিশার্স, ২০১০), পৃ. ১৩৬-১৩৭।

৫ রাষ্টপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে ৩ জুন, ১৯৮১ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে তৎকালীন স্পিকার মীর্জা গোলাম হাফিজ যে শোকপ্রস্তাব উথ্থাপন করেন এবং যা সংসদে গৃহীত হয় তাতে বলা হয়, জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের তৃতীয় খ–ের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পাদটীকায় বলা হয় : মেজর জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠের ঐতিহাসিক মূল কপিটি নিরাপত্তার কারণে নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। তবে জিয়ার স্বকণ্ঠে টেপকৃত যে ইংরেজি ঘোষণাটি পাওয়া যায় তা নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

The Government of sovereign State of Bangladesh on behalf of our great leader, the supreme commander of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, we hereby proclaim the independence of Bangladesh, and that the Government headed by Sheikh Mujibur Rahman has already been formed.

It is further proclaimed that seventy –five million people of Bangladesh and that the Government headed by him is the only legitimate government of the people of independent sovereign state of Bangladesh which is legally and constitutionally formed and is worthy of being recognized by all the government of the world.

I, therefore, appeal on behalf of our great leader Sheikh Mujibur Rahman to the government of all the democratic neighboring countries to recognize the legalll government of Bangladesh and take effective steps to stop immediately the awefull genocide that had been carried on by the army of occupation from Pakistan.

To dub out the legally elected representatives of the majority of the people as secessionist is a crude joke and contradiction to truth which should befool none.

The guiding principles of the new State will be, first neutrality, second peace and third friendship to all enmity to none.

May Allah help us.

Joi Bangla. (আমাদের মহান নেতা, বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আমরা, সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের সরকার, এতদ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং ঘোষণা করছি যে, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ইতোমধ্যেই সরকার গঠিত হয়েছে। এতদ্বারা আরো ঘোষণা করা হচ্ছে যে, শেখ মুজিবুর রহমানই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধির একমাত্র নেতা এবং তার নেতৃত্বাধীন সরকারই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনগণের একমাত্র বৈধ সরকার, যা আইনসম্মত ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে গঠিত হয়েছে এবং যা পৃথিবীর সকল সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকারী।

অতএব, আমি আমাদের মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে সকল গণতান্ত্রিক ও প্রতিবেশী দেশসমূহের কাছে বাংলাদেশের বৈধ সরকারকে স্বীকৃতিদান এবং পাকিস্তানী দখলদার সেনাবাহিনী কর্তৃক ভয়াবহ গণহত্যা অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি।

বৈধভাবে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধিবর্গকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে অভিহিত করা একটি নির্মম পরিহাস এবং সত্যের বরখেলাপ মাত্র, যার দ্বারাা কারও বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়।

নতুন রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি হবে প্রথম নিরপেক্ষতা, দ্বিতীয় শান্তি, এবং তৃতীয় সবার সাথে বন্ধুত্ব কারও সাথে শত্র–তা নয়।

আলণ্ডাহ আমাদের সহায় হউন।

জয় বাংলা।) দ্রষ্টব্য, আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের রাজনীতি : সংস্কৃতির স্বরূপ* (ঢাকা : অন্যান্য, ২০০১), পৃ. ২১১-২১৩।

৬ পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবি সম্বলিত ৬-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই কর্মসূচির দাবিগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. পাকিস্তানকে সত্যিকার যুক্তরাষ্ট্ররূপে গড়তে হবে এবং সেখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন করতে হবে। ২. কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকবে। অবশিষ্ট সকল বিষয় প্রদেশের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। ৩. (ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করতে হবে। এবং দুই অঞ্চলের জন্য দু'টি স্বতন্ত্র 'স্টেট ব্যাংক' থাকবে। অথবা, (খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে; কিন্তু সংবিধানে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকবে যাতে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে মুদ্রা পশ্চিম-পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। ৪. সকল প্রকার কর ও খাজনা ধার্য ও আদায় করার ক্ষমা প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়যোগ্য অর্থের একটি নির্ধারিত অংশ বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে জমা দিতে হবে। ৫. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সরকারগুলো স্বাধীন হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে অথবা সংবিধানে নির্ধারিত হারে আদায় করা হবে। ৬. পূর্ব-পাকিস্তানের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণাধীনে 'মিলিশিয়া' বা আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করতে হবে। দ্রষ্টব্য, আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের রাজনীতি : সংঘাত ও পরিবর্তন* (রাজশাহী : পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯৪), পৃ. ৩২-৩৩।

৭ *The Bangladesh Observer*, 22 April 1977.

৮ Abul Fazl Huq, *Bangladesh Politics : The Problems of Stability* (Dhaka : Hakkani Publishers, 2011), p. 94.

৯ অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে নিম্নলিখিত সাংবিধানিক পরিবর্তন আনা হয় : ১. মূল সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম সম্পর্কে কোনো বিধান ছিল না। অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ২-এ উপ-অনুচ্ছেদ '২ক' যোগ করে বিধান করা হয়- "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাবে।"

১০ Abul Fazl Huq, *Bangladesh Politics : The Problems of Stability, op.cit.,* p. 94.

১১ Rehean Sobhan, *Bangladesh : Problems of Governance* (Dhaka : The University Press Limited, 1993), pp. 15-20.

১২ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *বাঙালীর জাতীয়তাবাদ* (দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১১), পৃ. ২৬০-২৬১।

১৩ Moudud Ahmed, *Bangladesh : Constitutional Quest for Autonomy* (The University Press Limited, 1979), p.152.

১৪ Rounaq Jahan (edi), *Bangladesh : Promise and Performance* (Dhaka : The University Press Limited, 2000), p. 6.

১৫ Rounaq Jahan (edi.), *Bangladesh : Promise and Performance*, *op.cit.,* p. 21; আব্দুল ওয়াহেদ তালুকদার, *গণতন্ত্রের অন্বেষায় বাংলাদেশ* (ঢাকা : পা–ুলিপি, ১৯৯৩), পৃ. ১১৪।

১৬ Muhammad A. Hakim, *Bangladesh Politics : The Shahabuddin Interregnam* (Dhaka : University Press Limited, 1993), p. 15.

১৭ Craig Baxter, "Bangadesh in 1991 : A Parliamentary System", *Asian Servey*, Vol. 32. February, p. 166.

১৮ Rounaq Jahan (edi.), *Bangladesh : Promise and Performance*, *op.cit.,* p. 23.

১৯ ১৯৯৬ সালের ২৫-২৬ মার্চের রাতে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা সংবলিত ত্রয়োদশ সংবিধান সংশোধন বিল গৃহীত হয়।

ত্রয়োদশ সংশোধনীর দ্বারা সংবিধানে ৫৮ক, ৫৮খ, ৫৮গ ও ৫৮ঘ সংখ্যক চারটি অনুচ্ছেদ সংযোজন করে একটি অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা করা হয়।

ক. একজন প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে অনধিক ১০ জন উপদেষ্টা সমবায়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে [৫৮গ (১)] সংসদ ভেঙে দেয়া বা ভঙ্গ হবার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টাগণ নিযুক্ত হবেন। যে তারিখে প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন সেই তারিখ পর্যন্ত ইতোপূর্বে দায়িত্ব পালনরত প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণ তাঁদের পালন করতে থাকবেন [৫৮গ (২)]।

খ. রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিদের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসর গ্রহণ করেছেন তাঁকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। যদি উক্তরূপ প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করতে সম্মত না হন, তাহলে রাষ্ট্রপতি তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন [৫৮গ (৩)] যদি কোনো অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে সম্মত না হন, তাহলে রাষ্ট্রপতি আপিল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচাররককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। যদি উক্তরূপ বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারককে রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন [৫৮গ (৪)]। যদি আপিল বিভগের কোনো অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহলে রাষ্ট্রপতি যতদূর সম্ভব প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে আলোচনাক্রমে এই সংশোধনীর অধীনে যোগ্য কোনো নাগরিককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন [৫৮গ (৫)]।
উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ায় যদি প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ সম্ভব না হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতি এই সংবিধানের অধীনে তাঁর দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন [৫৮গ (৬)]।

গ. উপদেষ্টা পদে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা :
১. সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য হতে হবে;
২. তিনি কোনো রাজনৈতিক দল বা তার অঙ্গ সংগঠনের সদস্য হবেন না;
৩. তিনি আসন্ন সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী নন বা প্রার্থী হবেন না এই মর্মে লিখিত সম্মতি দেবেন;
৪. তিনি ৭২ বছরের অধিক বয়স্ক হবেন না [৫৮গ (৭)]।

ঘ. রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শক্রমে উপদেষ্টাগণকে নিয়োগ করবেন [৫৮গ (৮)]। প্রধান উপদেষ্টা বা কোনো উপদেষ্টা নির্ধারিত যোগ্যতা হারালে তিনি উক্ত পদে বহাল থাকতে পারবেন না। নতুন সংসদ গঠিত ও নতুন প্রধানমন্ত্রী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বহাল থাকবে [৫৮গ (১২)]।

ঙ. প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করবেন এবং উপদেষ্টাগণ একজন মন্ত্রীর পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করবেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদকালে প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক বা তাঁর কর্তৃত্বে সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী প্রধান উপদেষ্টা তা প্রয়োগ করবেন। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদে প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিচালিত হবে।

চ. তত্ত্বধায়ক সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করবে, প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সাহায্য ও সহযোগিতায় দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করবে এবং এরূপ কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা ব্যতীত কোনো নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না [৫৮খ (১)]। তত্ত্বধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যেরূপ সাহায্য ও সহায়তার প্রয়োজন হবে, নির্বাচন কমিশনকে সেরূপ সকল সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করবে [৫৮খ (২)]।

মেয়াদ অবসানের কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙে যাওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

[২০] Enayetur Rahim, "Bangladesh : A Historical Ledger", in A. M. Chowdhury & Fakrul Alam (edi.), *Bangladesh : on the Threshold of the Twenty-First Century* (Asiatic Society of Bangladesh, 2002), p. 33-35.

[২১] সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৫ (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৩৫৪।

[২২] মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৯), পৃ. ২৩৪-২৩৫।

[২৩] Harun ur Rashid, *Bangladesh India Relations : Living with a Big Neighbour* (Dhaka : A H Development Publishing House, 2010), p. 157.

[২৪] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৬।

[২৫] আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি* (রংপুর : টাউন স্টোর্স, ১৯৯৮) পৃ. ২৬৮।

[২৬] *দৈনিক সংবাদ*, ২২ মে ২০০১।

[২৭] *দৈনিক সংবাদ* ও *জনকণ্ঠ*, ৩১ মার্চ ২০০১।